بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ই জুন, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৪)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা সেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা আমাদের ইহ এবং পরকালকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে, আর সেই বিষয়টি হলো, 'لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ'। সুতরাং রোযা বিধিবদ্ধ করা এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও তা আবশ্যক ছিল বরং তোমাদের তাক্বওয়া অবলম্বনের দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা গুরুত্বপূর্ণ যেন তোমরা পাপ এড়িয়ে চলতে পার বা পাপ বর্জন করতে পার। রোযা কী? রোযা হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এক মাস সেসব বৈধ কার্যকলাপ থেকেও বিরত থাকা সাধারণ অবস্থায় যার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং এ মাসে মানুষ যেখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বৈধ কার্যকলাপ থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করে একথা ভাবাই যায় না যে, সে অবৈধ কার্যকলাপ এবং পাপে লিপ্ত হবে। কেউ যদি এই চেতনা এবং প্রেরণা নিয়ে রোযা না রাখে যে, আমি খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে এ দিনগুলো অতিবাহিত করব এবং প্রত্যেক সেই কথা কাজ থেকে বিরত থাকব যা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন আর প্রত্যেক সেই কাজ করব যা করার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এই চেতনা এবং এই প্রেরণা দৃষ্টিপটে না থাকে, সবসময় আমাদের সামনে না থাকে, আর এ অনুসারে যদি জীবন যাপনের চেষ্টা না করা হয় তাহলে এই রোযা অর্থহীন এবং নিরর্থক। মহানবী (সা.) বলেছেন, **তোমাদেরকে কেবল ক্ষুধার্ত রাখার আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রয়োজন নেই**। রোযার মূল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের উন্নতি করা। আল্লাহ্ তা'লা প্রশিক্ষণের জন্য একটি মাস দিয়েছেন। এতে নিজেদের তাক্বওয়ার মানকে উন্নত কর। এই তাক্বওয়া তোমাদের পুণ্যের মানকে উন্নত করবে, তোমাদেরকে স্থায়ী পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, খোদার নৈকট্যও দান করবে আর একই সাথে অতীতের পাপও মোচন হবে। মহানবী (সা.) একবার বলেন, **যে ব্যক্তি ঈমানের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমযানের রোযা রাখে এবং আত্মসংশোধনের চেতনা নিয়ে রাখে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে**। এখন অতীতের পাপ যদি মোচন হয় বা ক্ষমা করে দেয়া হয় আর তাক্বওয়া অবলম্বনের পর মানুষ যদি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে হয় তাহলে এমন মানুষ অবশ্যই রমযান অতিবাহিত করার যেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

রয়েছে সে ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে বরং জীবনের উদ্দেশ্যও সে অর্জন করেছে। তাক্বওয়ার যেসব উপকারিতা এবং কল্যাণ যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আছে তার মাঝে একটি উপকারিতা যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং উল্লেখ করেছেন তাহলো,

'فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ' (সূরা আল্-মায়েদা: ১০১)

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানরা! খোদার তাক্বওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পার বা সফলকাম হতে পার। সুতরাং কে এমন হবে যে সাফল্য চায় না। ইহজাগতিক সাফল্য এ জগতেই থেকে যাবে। প্রকৃত সফলতা হলো, উভয় জগতের সাফল্য অর্জন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক তাহলে শোন! তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই তা লাভ হতে পারে। আজ যেখানে নামধারী আলেমরা ধর্মের নামে মুসলমানদের দ্বারা এমন সব কাজ করাচ্ছে যা সম্পূর্ণরূপে খোদার ইচ্ছা পরিপন্থী এবং তাক্বওয়া বিবর্জিত সেখানে আহমদীরা পরম সৌভাগ্যবান! কারণ তারা যুগ ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিককে মানার সৌভাগ্য লাভ করেছে— যিনি আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি সূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাক্বওয়া কি আর তাক্বওয়া কোন কোন বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে? জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের কাছে এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী প্রত্যাশা রাখেন? এসব বিষয় বোঝা এবং জানার জন্য আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্বৃতি নির্বাচন করেছি যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। এগুলো সেই পথের দিশারী কথা যা আমাদেরকে ঈমানে সুদৃঢ় করে, তাক্বওয়ায় উন্নত করে, আর তাক্বওয়া অর্জনের জন্য যেই তরবীয়ত এবং প্রশিক্ষণের মাস আমরা অতিবাহিত করছি তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তাক্বওয়া কোন সামান্য বিষয় নয়। এর মাধ্যমে সেসব শয়তানের মোকাবিলা করতে হয় যারা মানুষের প্রতিটি আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সামর্থের ওপর ছেয়ে আছে। এসব শক্তি নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য প্রবৃত্তির প্রাধান্যের সময় মানুষের ভেতর এক শয়তান অর্থাৎ পাপে প্ররোচনা দাতা যেসব শক্তি রয়েছে বা যেসব চিন্তাধারা মানুষকে পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য থেকে বিরত রাখে তা-ই মানুষের আভ্যন্তরীণ শয়তান। তিনি (আ.) বলেন, **যদি এসব শক্তি এবং বৃত্তির সংশোধন না হয়** অর্থাৎ তোমাদের মাঝে অবাধ্য প্রবৃত্তিরূপী যে শয়তান রয়েছে— যদি এসবের সংশোধন না কর বা এর যদি সংশোধন না হয় তাহলে কি হবে? **এরফলে তা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে।** তিনি (আ.) বলেন, **জ্ঞান এবং বুদ্ধির অন্যায় ব্যবহারের ফলে মানুষ শয়তান হয়ে যায়।** জ্ঞান খুব ভালো জিনিস। মানুষ যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে অনেক মহান কাজ করতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি নিজেদের এই জ্ঞান এবং বুদ্ধি নিয়ে অহংকার আরম্ভ করে, এগুলোকে যদি অন্যায় কাজে ব্যবহার করে অথবা পুণ্যের মোকাবিলায় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি এ সবকে দাঁড় করায় তাহলে তা শয়তান শয়তানে রূপ নেয়। তিনি (আ.) বলেন, **মুত্তাকী বা খোদাভীরু মানুষের কাজ হলো, এগুলোকে এবং এমন অন্যান্য শক্তিবৃত্তিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা।** জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য বা শক্তিবৃত্তি

যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তা যথাযথ স্থানে ব্যবহার করা হলো সত্যিকার মুত্তাকির কাজ। নতুবা যদি সঠিক স্থানে ব্যবহার না হয় তাহলে **এসব বিষয়ই মানুষের ক্ষতি করে, আল্লাহ্ থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং শয়তানের নিকটতর করে।**

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **তাক্বওয়ার বিষয়টি অতীব সূক্ষ্ম, তা অর্জন কর। আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দাও। যার কাজ-কর্মে সামান্যতম লোক দেখানো ভাবও থাকে আল্লাহ্ তা'লা তার কর্মকে তার মুখেই ছুঁড়ে মারেন।** কোন কাজে বা কর্মে যেন লোক দেখানো ভাব বা কৃত্রিমতা না থাকে। **যদি এমনটি হয় তাহলে সেই কাজ আল্লাহ্‌র জন্য নয়।** সেটি ইবাদত হোক বা কুরআন তিলাওয়াতই হোক বা রোযা হোক বা অন্য যে কোন পুণ্যই হোক না কেন। তিনি (আ.) বলেন, **মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেউ যদি তোমাকে বলে যে, তুমি কলম চুরি করেছ তাহলে তুমি রাগ কেন কর?** কেউ যদি বলে, আমার কলম এখানে পড়েছিল, তুমি তা চুরি করেছ, তখন একথা শুনে তুমি ক্ষেপে যাও কেন? **তোমার অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণরূপে যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে,** যদি তাক্বওয়া থাকে, পুণ্য থাকে, তাহলে রাগ বা ক্রোধ থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। **তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে আমিত্বের দাসত্ব করো না বরং তোমার আমল বা কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত কর।** তিনি (আ.) বলেন, **রাগ করার অর্থ হলো তুমি সত্যের ওপর নও** অর্থাৎ তোমার আসল উদ্দেশ্য খোদার সন্তুষ্টি ছিল না বরং তুমি তোমার অহমিকার দাসত্ব করছ। **যতক্ষণ মানুষের জীবনে অগণিত মৃত্যু না আসবে সে মুত্তাকী হতে পারে না।** তিনি (আ.) বলেন, **মু'জিযা বা নিদর্শন এবং ইলহামও তাক্বওয়ারই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। মূল হলো তাক্বওয়া। কেউ যদি বলে, আমার প্রতি ইলহাম হয়, আমি নিদর্শন দেখিয়ে থাকি, তাহলে তাক্বওয়ার কল্যাণে তা একটি অতিরিক্ত দিক। আসল বিষয় হলো তাক্বওয়া। তাই ইলহাম এবং রুইয়্যার পিছনে ছুটবে না বরং তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টা কর। যে মুত্তাকী হয়ে থাকে তার ইলহামই সঠিক। যদি তাক্বওয়া বা খোদাভীতি ও খোদাভীরুতা না থাকে তাহলে ইলহামও নির্ভরযোগ্য নয়, এতে শয়তানের ভূমিকা থাকতে পারে। কেউ ইলহাম লাভ করে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাক্বওয়া যাচাই করো না, একথা মনে করো না যে, সে বড় নেক, বড় মুত্তাকী, দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা রাখে।** এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে না বরং তার ইলহামকে তার তাক্বওয়ার মাপকাঠিতে যাচাই করবে। সেসব ইলহাম সঠিক বা সত্য কিনা তা যাচাই করতে হলে দেখ তার মাঝে তাক্বওয়া আছে কিনা। **অনেক বিষয় ছোট ছোট হয়ে থাকে।** তিনি (আ.) একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। কেউ যদি বলে, তুমি আমার এই জিনিস চুরি করেছ, এটি শুনে রেগে যাওয়া, ক্ষেপে যাওয়া, নিজের অধিকারের জন্য অন্যের ক্ষতি করা সঠিক নয়। এই বিষয়গুলো মেনে চলা হলো, তাক্বওয়া। যদি এসব না থাকে তাহলে কেউ যদি লক্ষবারও বলে যে, আমি বহু সত্য স্বপ্ন দেখি, আমার দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা আছে, একথাগুলোর সবই ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। **চতুর্দিক দিক থেকে চোখ বন্ধ করে তাক্বওয়ার মাইল ফলক অতিক্রম কর। নবীদের আদর্শ অনুকরণ কর। যত নবী এসেছেন সবার উদ্দেশ্য একটিই ছিল, আর তাহলো, তাক্বওয়ার পথ দেখানো এবং শেখানো।** ' إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ

إِلَّا الْمُتَّقُونَ' (সূরা আল্-আনফাল: ৩৫)। **কুরআন শরীফ তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথের দিশা দিয়েছে। নবীর পরাকাষ্ঠা উম্মতের পরাকাষ্ঠার দাবি রাখে। মহানবী (সা.) যেহেতু খাতামান্নাবিঈন ছিলেন তাই তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যাবলী পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো পরম মার্গে পৌছার মাধ্যমেই নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। যে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং নিদর্শন দেখতে চায় আর অলৌকিকভাবে দেখতে চায় তার জন্য আবশ্যক হবে নিজের জীবনকে অলৌকিক করে তোলা।** অতএব এই বিপ্লব আমাদের মাঝে আনয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর মান্যকারী এবং তাঁর উম্মতভুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তিনিই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর উত্তম আদর্শ অনুকরণ-অনুসরণ করা উচিত। আর এর জন্য আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক এবং প্রকৃত তাক্বওয়া সৃষ্টি হওয়া চাই।

'সব পুণ্যের মূল হলো তাক্বওয়া' এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **তাক্বওয়া অবলম্বন কর। তাক্বওয়া সব কিছুর মূল। তাক্বওয়া শব্দের অর্থ হলো, প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাপের বিচরণস্থল এড়িয়ে চলা। তাক্বওয়া হলো— যে বিষয়ে সন্দেহ জাগে যে, এটি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাও এড়িয়ে চল।** কেবল প্রকাশ্য পাপতে এড়িয়ে চলবেই বরং যদি সন্দেহ থাকে, যে যদি এবিষয়টি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাহলে তাও এড়িয়ে চল। তিনি (আ.) বলেন, **হৃদয়ের দৃষ্টান্ত হলো, একটি বড় নহর বা নদীর মতো যা থেকে ছোট ছোট খাল বা নালা বের হয়।** পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানে ছোট নহরকে আঞ্চলিক ভাষায় 'সূয়া' বা 'রাজবাহা' বলা হয়। তিনি (আ.) বলেন, **হৃদয়ের নহর থেকেও ছোট ছোট নালা নির্গত হয় যেমন জিহ্বা, হাত ইত্যাদি আর সেই সমস্ত সেসব কাজের প্রভাব হৃদয়ের ওপর পড়ে থাকে। ছোট নহর বা নালার পানি যদি নোংরা এবং ময়লা হয় তাহলে অনুমান করা হয় যে, বড় নহরের পানিও দূষিত। সুতরাং যদি দেখ যে, কারো জিহ্বা বা হাত অথবা পা তথা কোন অঙ্গ অপবিত্র তাহলে ধরে নিতে পার যে, তার হৃদয়ও এমন। যদি কারো মুখ নোংরা হয় আর রোযা রাখা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ এবং গালমন্দ থেকে বিরত না হয় বা তার হাতে যদি অন্যায় কাজ সাধিত হয় তাহলে ধরে নিতে পার, তার হৃদয়ও পরিচ্ছন্ন নয় এবং সে তাকওয়া থেকে দূরে।**

দীনহীনের ন্যায় জীবন যাপন করা উচিত আর এ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **তাক্বওয়াশীলদের জন্য শর্ত হলো, দীনহীনের ন্যায় জীবন যাপন করা। এটি তাক্বওয়ারই একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদের অনর্থক রাগ এবং ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। রাগ এবং ক্রোধ যদি সঠিক এবং যথাস্থানে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা বৈধ কিন্তু অবৈধ রাগ এবং ক্রোধ, ছোট ছোট বিষয়ে রাগ ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাক। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী এবং সত্যবাদীদের জন্য শেষ ও কঠিন গন্তব্য হলো ক্রোধ এবং রাগ বর্জন।** সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো, রাগ এবং ক্রোধ থেকে বিরত থাকা, আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। আত্মশ্লাঘা এবং আত্মম্ভরিতা রাগ থেকেই উদ্ভূত হয়। **অনুরূপভাবে কোন কোন সময় রাগ এবং ক্রোধ আত্মশ্লাঘা এবং আত্মম্ভরিতায় পর্যবসিত হয়। আর**

রাগের কারণ হলো, মানুষের মাঝে অহংকার রয়েছে যে সে নিজেকে মনে করে, কিছু একটা হনুরে, বিনয় নেই। আজ ঘর থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ স্তরে এই রাগই নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। রাগ তখন হয় যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি চাই না যে, আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পর পরস্পরকে বড় বা ছোট মনে করবে বা একে অন্যের ওপর গর্ব করবে বা অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। আল্লাহ্ তা'লাই জানেন কে বড় আর কে ছোট। এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্য করা বৈ-কি। যার মাঝে এই অভ্যাস রয়েছে, আশঙ্কা রয়েছে যে, বীজের মতো অঙ্কুরিত হয়ে তা তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। কাউকে যদি তুচ্ছ মনে কর, ছোট বা হেয় মনে কর, কাউকে যদি হাসি-ঠাট্টা কর এবং হেয় দৃষ্টিতে দেখ; তাহলে এই বিষয়গুলো তাচ্ছিল্য বৈ আর কি। আর এই বীজ যদি হৃদয়ে দানা বাধে তাহলে সেটি অঙ্কুরিত হয় এবং মহিরূহে পরিণত হয় আর মানুষকে ধ্বংস করে। তিনি (আ.) বলেন, এটি পরিহার কর। অনেকেই বড়দের সাথে সাক্ষাতে পরম বিনয় প্রদর্শন করে। কিন্তু বড় সে যে দীনহীনের কথাও বিনয়ের সাথে শুনে, তাদের মন জয় করে এবং তাদের কথাকে সম্মান করে। ব্যঙ্গ বা উপহাসমূলক কোন বলা উচিত নয় যার ফলে কেউ দুঃখ পেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

'وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ' (সূরা আল্-হুজুরাত: ১২)।

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা পরস্পরের বিদ্রুপাত্মক নাম রাখবে না। এটি দুরাচারী, অনাচারী এবং পাপাচারীদেরই কাজ। কারো ব্যঙ্গাত্মক বা উপহাসমূলক কোন নাম রাখার মত কাজ তারা করে যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। 'ফাজের' তারা যারা সঠিক পথ ছেড়ে দেয়, মিথ্যাবাদী, পাপাচারী দুশ্চরিত্র, আনুগত্যের গন্ডি থেকে বহিস্কৃত— এমন মানুষকেই ফাজের বলা হয়। যে ব্যক্তি কারো এমন ব্যঙ্গাত্মক নাম রাখে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ স্বয়ং এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়। ভাইদেরকে তুচ্ছ মনে করবে না। সবাই যখন একই প্রস্রবণ থেকে পান করছ তখন কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি রয়েছে। কোন জাগতিক নীতির ভিত্তিতে কেউ সম্মানিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বড় সে যে মুত্তাকী। 'إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ' (সূরা আল্-হুজুরাত: ১৪)।

এরপর মুত্তাকী কে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুত্তাকী তারা যারা নম্রতা এবং দীনতার মাঝে জীবন যাপন করে। তারা অহংকার সূচক কথা বলে না। তাদের কথাবার্তা এমন হয় যেভাবে কোন স্বল্প বয়স্ক বালক জ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলে। যেভাবে এক বালক বয়স্ক ব্যক্তি জ্যোষ্ঠের সাথে বা দরিদ্র যেভাবে ধনীর সাথে কথা বলে তারাও সেভাবে কথা বলে। বড় এবং ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পরম বিনয়ের সাথে কথা বলে। আমাদের সর্বাবস্থায় সেই কাজ করা উচিত যার মাঝে আমাদের কল্যাণ বা সাফল্য নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঠিকা নেন নি। তিনি তাক্বওয়া চান। যে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে সে সুমহান মর্যাদায় উপনীত হবে। মহানবী (সা.) বা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর

মাঝে কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মান লাভ করেন নি। যদিও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ্ পৌত্তলিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি তো নবুয়্যত দিয়ে যান নি। এটি খোদার কৃপা ছিল সেসব নিষ্ঠার কারণে যা তার প্রকৃতির অংশ ছিল। এটিই ফযল এবং কৃপাকে আকর্ষণ করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি নবীকূল-পিতা ছিলেন, তিনি তার নিষ্ঠা এবং তাক্বওয়ার কল্যাণেই পুত্রকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন নি। স্বয়ং আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমাদের নেতা এবং মনীব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখুন! তিনি (সা.) সকল প্রকার নোংরা ও অপবিত্র আন্দোলনের মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা এবং কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করেন নি। এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। সুতরাং এই হলো মহান আদর্শ যা আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

এরপর সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা কীভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং প্রকৃত বুদ্ধি খোদার দিকে প্রত্যাবর্তণ ছাড়া অর্জন হতেই পারে না। এ কারণেই বলা হয়েছে, মু'মিনের অন্তঃদৃষ্টিকে ভয় কর কেননা, সে খোদা তা'লার জ্যোতিতে দেখে। যতক্ষণ তাক্বওয়া না থাকবে ততক্ষণ সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং সত্যিকার বুদ্ধি ও মেধা অর্জন হওয়া সম্ভব নয়। তিনি (আ.) বলেন, যদি তোমরা সফল হতে চাও তাহলে বিবেক-বুদ্ধি খাটাও, চিন্তা কর, ভাব। চিন্তা এবং প্রণিধানের ওপর পবিত্র কুরআনে বারবার জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একদিকে কোন ব্যক্তি যদি নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে, অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, বিবেক খাটাও, বুদ্ধি খাটাও জ্ঞানকে কাজে লাগাও, চিন্তা ও প্রণিধান কর। তিনি (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, কুরআনে বারবার এ সম্পর্কে তাকিদী নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন কিতাব মকনূন(প্রচ্ছন্ন গ্রন্থ) কুরআন তথা আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে চিন্তা কর, তা পড়, এর সূক্ষ্ম বিষয়াদি জানার চেষ্টা কর, এর অনুবাদ পড়, তফসীর পড়। রমযান মাসে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, দরসও হয়, সেদিকে মনোযোগ দাও। এবং পবিত্র ও মুত্তাকী প্রকৃতির অধিকারী হয়ে যাও। তোমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হয়ে যায় একই সাথে বিবেক-বুদ্ধি যদি খাটাও, তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো যদি অনুসরণ কর তাহলে এই উভয়ের যোগসূত্রে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবে যা হলো, 'رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ' (সূরা আলে ইমরান: ১৯২)

তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের হৃদয় থেকে যখন এই দোয়া উদ্ভূত হবে তখন বুঝতে পারবে যে, এই সৃষ্টি বৃথা নয় বরং তা সত্যিকার স্রষ্টার সত্যতা এবং অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে যেন ধর্মের জন্য সহায়ক বিভিন্ন জ্ঞান ও প্রযুক্তি সামনে আসে। একদিকে জ্ঞান এবং বুদ্ধি আধুনিক যুগের লোকদেরকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, জ্ঞান এবং মেধা ও বুদ্ধিকে যদি কাজে লাগাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তাকে জানতে পারবে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হবে। আজকাল মানুষ বলে, খোদা নেই। খোদাকে তারা এই কারণে দেখে না

যে, তাদের ধর্মের চোখ অন্ধ। নিজেদের বুদ্ধি আর মেধাকে কেবল জাগতিক মাপকাঠিতে যাচাই করে, তাদের দৃষ্টি কেবল দুনিয়ার প্রতি এবং বস্তু জগতের প্রতি। তারা ধর্ম থেকে এই জন্য বিচ্যুত হয়েছে যে, তাদের ধর্ম সেকেলে এবং পুরোনো হয়ে গেছে। খোদার ঐশী দিক নির্দেশনা তাদের আর লাভ হয় । তাই এ সম্পর্কে চিন্তা করা বা এই ক্ষেত্রে বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগানো তাদের জন্য সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ধর্মীয়গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন। তা চিরকালের জন্য জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডার। কুরআন সম্পর্কে চিন্তা এবং প্রণিধান মানুষকে তাক্বওয়ায় উন্নত করে, খোদার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ যখন তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করে তখন আল্লাহ্ তা'লাকে দেখতে পায়। তাক্বওয়া হলো, খোদা দর্শনের আয়না। এরপর প্রণিধানকারী এবং তাক্বওয়ায় যারা উন্নতি করে তারা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তাকে পর্বত শৃঙ্গেও দেখতে পায়, গভীর উপত্যকায়ও দেখতে পায়, নদী এবং সমুদ্রেও দেখতে পায় আর চন্দ্র এবং সূর্যেও দেখতে পায়। বিশ্ব জগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রে আল্লাহ্‌র সত্তাকে তারা খুঁজে পায়। একজন প্রকৃত মু'মিন কেবল শুষ্ক যুক্তি এবং দর্শনের অন্ধ অনুকরণ করে না বরং খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন স্থাপন করে খোদার সত্তা থেকে জ্যোতি লাভ করে। রোযার মাসে সেই আলোর সন্ধান করাও আমাদের জন্য আবশ্যক, কেননা রমযানের উদ্দেশ্য হলো জাগতিক বা বাহ্যিক আহার কমিয়ে আধ্যাত্মিক খোরাকের সন্ধান করা, আর এক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ উদ্দেশ্যে বলেন, **প্রত্যেকের আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা উচিত, নিজের নফসকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত, নিজের শক্তি-বৃত্তি বা শক্তি-সামর্থ্যকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত। যদি শক্তি-বৃত্তি এবং সামর্থ্যের সঠিক ব্যবহার করতে হয় তাহলে এ সবকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর। আর এটিই সেই তাক্বওয়া যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান।**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **যদি জামাতভুক্ত হয়ে থাক, ইসলামের সেবা যদি করতে চাও তাহলে প্রথমে স্বয়ং তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন কর।** শুধু কথার খৈ ফুটিয়ে ইসলামের সেবা করা সম্ভব নয় বরং আমাদের তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এরপর বিষয়ের ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **আমি পুনরায় আসল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি অর্থাৎ 'صَابِرُوا وَرَابِطُوا' (সূরা আলে ইমরান: ২০১)। যেভাবে শত্রুর মোকাবিলায় সর্বদা সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা থাকা আবশ্যক হয়ে থাকে যেন শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে অনুরূপভাবে তোমরাও প্রস্তুত থাক।** 'صَابِرُوا وَرَابِطُوا'-র তফসীরে তিনি (আ.) এসব কথা বলেন। সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা হয় শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সৈন্য দাঁড় করানো হয় যেন শত্রু তোমাদের সীমানা অতিক্রম করতে না পারে। অনুরূপভাবে তোমরাও সৈনিকদের মত প্রস্তুত থাক যেন কোথাও শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ইসলামের ক্ষতি করতে না পারে। তিনি (আ.) বলেন, **আমি পূর্বেও বলেছি, যদি ইসলামের সহায়তা এবং সেবা করতে চাও তাহলে প্রথমে স্বয়ং তাক্বওয়া অবলম্বন কর আর পবিত্র হও যার কল্যাণে তোমরা খোদা তা'লার আশ্রয়ের দুর্ভেদ্য দূর্গে প্রবেশ করতে পারবে এবং এরফলে তোমরা সেবার সেই সম্মান এবং যোগ্যতা লাভ করবে যার মাধ্যমে তোমরা খোদা তা'লার নিরপত্তার দুর্ভেদ্য দূর্গে স্থান পাবে এবং**

একই সাথে তোমরা এই খিদমতের সম্মান এবং যোগ্যতাও লাভ করবে। খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান পেলে ইসলামের হিফাযতের বা খিদমতের সম্মান তোমরা লাভ করবে এবং তোমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কেননা; তোমরা নিজেদের সংশোধন করেছ এবং তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। তিনি (আ.) বলেন, **তোমরা দেখছ যে, জাগতিক দিক থেকে মুসলমানরা কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন জাতি তাদেরকে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তোমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিও যদি হারিয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে ধ্বংস নিশ্চিত বলে ধরে নিতে পার। তোমরা নিজেদের হৃদয়কে এমনভাবে পরিশুদ্ধ কর যেন পবিত্র শক্তি তাতে স্থান পায় এবং সীমান্তে বাঁধা ঘোড়ার মত তা যেন দৃঢ় ও হিফাযতকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযল সব সময় মুত্তাকী এবং সরল প্রাণ লোকদের সাথে থাকে। নিজেদের চরিত্র এবং রীতি-নীতি এমন করো না যার ফলে ইসলামের দুর্নাম হতে পারে। যেসব মুসলমান অপকর্মশীল এবং যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে না তাদের কারণে ইসলামের দুর্নাম হয়।** কোন মুসলমান মদ পান করে কোন স্থানে গিয়ে বমি করে, পাগড়ী গলায় থাকে, সে গর্ত এবং নোংরা নালা-নর্দমায় পড়তে থাকে, তার ওপর পুলিশের জুতা পড়ে, হিন্দু এবং খ্রিষ্টানরা তাকে দেখে হাসি-ঠাট্টা করে। তার এমন শরীয়ত পরিপন্থী কাজ কেবল তারই হাসি-ঠাট্টার কারণ হয় না বরং পক্ষান্তরে এর প্রভাব পড়ে ইসলামের ওপর, এর মাধ্যমে ইসলামের দুর্নাম হয়। একটা ছোট দল হলেও বা সন্ত্রাসী ও অপকর্মশীল মানুষ কতিপয় হলেও আজকাল কেউ একথা বলে না যে, এদের সংখ্যা খুবই কম বরং তারা ইসলামেরই দুর্নাম করে, ইসলামকে অভিযুক্ত করা হয় যে ইসলামের শিক্ষাই এমন। ইসলামের সাথে সম্পর্কের দাবিদার কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ বিরোধীদেরকে অঙ্গুলী নির্দেশ করার সুযোগ দেয়। তিনি (আ.) বলেন, **জেলখানার রিপোর্টে এ সংক্রান্ত সংবাদ পড়ে আমি যারপরনাই মর্মাহত হই যখন আমি দেখি যে, মুসলমানরা অপকর্মের কারণে এভাবে শাস্তি পেয়েছে। আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায় যে, এরা যারা সঠিক-সরল বা সত্য ধর্মের অনুসারী তারা নিজেদের ভারসাম্যহীনতার কারণে শুধু নিজেদেরই দুর্নাম করে না বরং ইসলামকেও হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে।** তিনি (আ.) বলেন, **আমার কথার উদ্দেশ্য হল, তারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় যা শুধু তাদেরকেই নয় বরং ইসলামকেও সন্দেহ যুক্ত করে তুলে।** তিনি (আ.) বলেন, **অতএব নিজেদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ এমন বানাও যেন অবিশ্বাসীরাও তোমাদের সম্পর্কে সমালোচনার কোন সুযোগ না পায়, যা সত্যিকার অর্থে ইসলামের ওপরই বর্তায়।**

এরপর তাক্বওয়ার অনুসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) **বলেন, তাক্বওয়ার বহু অনুসঙ্গ রয়েছে, যেমন আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার অর্থাৎ নিজের প্রশংসা করা ও আত্মপ্রচারণা।** তাক্বওয়া হলো আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অবৈধ সম্পদ এবং দুঃশ্চরিত্র এড়িয়ে চলা, অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। **যে ব্যক্তি ভালো চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করে শত্রুও তার মিত্র হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** 'ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ' (সূরা হা মীম আস্ সাজদা: ৩৫)। **একটু চিন্তা কর! এই হিদায়াত কোন পথের দিশা দেয়। এর পিছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হল, বিরোধীরা যদি গালিও দেয় তবুও প্রত্যুত্তরে গালি না দেয়া বরং ধৈর্য ধারণ করা। এর ফলাফল যা হবে তাহলো**

বিরোধীরা তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়ে নিজেরাই লজ্জিত হবে এবং অনুশোচনা করবে। আর এই শাস্তি সেই শাস্তির চেয়ে অনেক মহান হবে যা প্রতিশোধমূলক ভাবে তুমি তাকে দিতে পার। এমনিতে সামান্য ব্যক্তিও এমন প্রদক্ষেপ নিতে পারে যা হত্যায় পর্যবসিত হতে পারে কিন্তু মানবতা এবং তাক্বওয়ার দাবি এটি নয়। নৈতিক সৌন্দর্য এমন একটি বৈশিষ্ট্য যে, চরম ক্ষতিকর ব্যক্তি বা শত্রুর ওপরও এর খুবই ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কোন ব্যক্তি কতই না সুন্দর কথা বলেছেন, 'লুতফ্ কুন লুতফ্ কেহ্ বেগানাহ্ শওয়াদ হালকা বেগোশ' অর্থাৎ মানুষের প্রতি সদয় হও যেন পরও আপন হয়ে যায়।

মানুষের পুণ্য এবং তাক্বওয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হল, মানুষের পুণ্য এবং তাক্বওয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত এবং পুণ্যের পথ অবলম্বন করা উচিত। তাহলেই কিছু হওয়া সম্ভব। 'إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ' (সূরা আর্-রা'দ: ১২)। 'আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতির অবস্থায় ততক্ষণ পরিবর্তন আনেন না যতক্ষণ সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।' অনর্থক বাজে ধারণা পোষণ করা এবং তুল কালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসা এটি খুবই অশোভন কাজ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, খোদার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, নামায পড়া, যাকাত দেয়া, অন্যের অধিকার খর্ব না করা এবং অপকর্ম ও নোংরা কর্ম থেকে বিরত থাকা। এটি প্রমাণিত সত্য যে, অনেক সময় একজনের অপকর্মে পুরো ঘর এবং গোটা শহর ধ্বংসের শিকার হয়। তাই পাপ পরিহার কর, তা ধ্বংস ডেকে আনে। যদি তোমাদের প্রতিবেশি কুধারণা পোষণ করে তাহলে তার কুধারণা দূরীভূত করার চেষ্টা কর এবং তাকে বুঝাও। মানুষ আর কত দিন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে? হাদীসে এসেছে, সমস্যা আসার পূর্বে যে দোয়া করা হয় সেটিই গৃহীত হয়। কেননা, ভয়-ভীতির মুখে প্রত্যেক ব্যক্তিই দোয়া করতে পারে আর আল্লাহ্মুখী হতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় হল, শান্তির সময় দোয়া করা। অতএব এদিকেই আমাদের কর্ণপাত করা উচিত বা মনোযোগ দেয়া উচিত।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হল, তাক্বওয়ার প্রভাব এবং প্রতাপ অন্যদের ওপরও পড়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের কখনও ধ্বংস করেন না। আমি একগ্রন্থে পড়েছি, হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব (রাহে.) নামে অনেক বড় একজন পুণ্যবান অতিবাহিত হয়েছেন, তিনি খুবই পবিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর মা'কে বলেন, আমি দুনিয়ার প্রতি বিতশ্রদ্ধ। কোন আধ্যাত্মিক নেতার সন্ধান করতে চাই, যিনি আমাকে প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শন করবেন। মা যখন দেখেন, সে এখন আর আমাদের কোন কাজের নয় তখন তার কথা গ্রহণ করেন আর বলেন, ঠিক আছে তোমাকে বিদায় দিচ্ছি, এই বলে তিনি গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে সঞ্চিত ৮০টি মুদ্রা নিয়ে আসেন এবং বলেন, শরীয়ত অনুসারে এই মুদ্রার ৪০টি আশরাফী বা মুদ্রা তোমার আর ৪০টি তোমার বড় ভাই-এর। তাই ৪০টি আশরাফী বা মুদ্রা প্রাপ্য অংশ হিসেবে আমি তোমাকে দিচ্ছি। এটি বলে সেই ৪০টি মুদ্রা তার জামার বগলের নীচে কামিয বা জামায় সেলাই করে রেখে দেন আর বলেন, নিরাপদ স্থানে গিয়ে তা বের করে নিও এবং প্রয়োজনে খরচ কর। হযরত সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব মাকে বলেন, আমি সফরে বের হচ্ছি, আমাকে কোন নসীহত করুন। মা বলেন, হে আমার পুত্র! কখনও মিথ্যা বলবে না, এই হল, তোমার জন্য নসীহত। একথা সব সময় স্মরণ রাখবে, এর ফলে তুমি প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে। একথা শুনে তিনি বিদায় নেন।

দৈবক্রমে যা ঘটে তাহলো, যাত্রাপথে তিনি যে জঙ্গল অতিক্রম করছিলেন সেই জঙ্গলে কিছু ডাকাত বা চোরের বসতি ছিল যারা পথিকদের ধনসম্পদ লুট-পাট করত। দূর থেকে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের ওপর তাদের চোখ পড়ে। কাছে এসে তারা এক কম্বল পরিহিত ফকিরকে দেখতে পেয়ে হাসি ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করে, তোর কাছে কিছু আছে কী? তিনি সদ্য মায়ের নসীহত শুনে এসেছিলেন যে, মিথ্যা বলবে না, তাই তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেন, হ্যাঁ, ৪০টি মুদ্রা আমার বগলের নিচে রয়েছে যা আমার মা থলি বা জেবের মত করে সিলিয়ে দিয়েছেন। সেই চোর মনে করে যে, এ ঠাট্টা করছে, দ্বিতীয় চোর জিজ্ঞেস করলে তাকেও তিনি একই উত্তর দেন। এক কথায় প্রত্যেক চোরকে তিনি একই উত্তর প্রদান করেন। তারা তাকে চোরদের দলনেতা বা বড় চোরের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, এ বার বার বলছে তার কাছে এতটি মুদ্রা আছে। তখন নেতা বলে, তার কাপড়ে খুঁজে দেখ, তল্লাশীর পর বাস্তবেই ৪০টি মুদ্রা পাওয়া যায়। সে আশ্চর্য হয় যে, এ তো অদ্ভুত মানুষ, এমন মানুষ আমরা কখনও দেখি নি। চোরদের নেতা জিজ্ঞেস করে, কারণ কী যে, তুমি এইভাবে আমাদেরকে তোমার অর্থের সন্ধান দিলে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ধর্মের সন্ধানে বা জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়েছি, যাত্রার সময় মা নসীহত করেছেন, কখনও মিথ্যা বলবে না। এটি আমার প্রথম পরীক্ষা ছিল তাই আমি কেন মিথ্যা বলব। একথা শুনে সেই চোরদের নেতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে যে, হায়! আমি একবারও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানলাম না, সে চোরদের সম্বোধন করে বলে, এই ব্যক্তির কথা এবং অবিচলতা আমার কার্য সাঙ্গ করেছে, তোমাদের সাথে আমি আর থাকতে পারি না, আমি তওবা করছি, তার এ কথা বলার পর বাকী চোররাও তওবা করে।

অতএব এ কথা আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে। আমরাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ জন্য মেনেছি যে, ধর্ম বিকৃতির শিকার হয়েছে। সঠিক ইসলামী শিক্ষার ওপর কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই শিক্ষা অনুসারে কেউ জীবন যাপন করছে না, যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষার ওপর চলতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান, আর এ কারণেই আমরা মেনেছি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি এরপর পাপ পরিত্যাগ করেছি? মিথ্যা এমন এক ব্যাধি যা বাহ্যতঃ সামান্য বিষয় মনে হয় কিন্তু এটি অনেক বড় পাপ। এই ঘটনার মানদণ্ডে আমরা যদি যাচাই করি তাহলে অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে এই পাপে লিপ্ত পাবে। অতএব বয়আত এবং তাক্বওয়ার দাবি হল, এই পাপ থেকে বিরত থাকা। এসব দেশে যারা আসে তাদের অনেকেই এমন আছে যারা একান্ত ধর্মীয় কারণে এসেছেন, ধর্মীয় কারণে বহিষ্কৃত হয়েছেন, স্বদেশে তাদের জন্য ধর্ম লালন-পালন সম্ভব ছিল না, স্বাধীনভাবে ধর্মমত প্রকাশের সুযোগ ছিল না, তাই আমাদের বিশেষ করে যারা পাশ্চাত্যে বসবাস করে তাদের অনেক বেশি সাবধান থাকা উচিত। আমাদের সামান্যতম কোন কাজও যেন এমন না হয় যা থেকে এমন কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বা এমন কোন কথা যেন মুখ থেকে বের না হয় যা মিথ্যা গণ্য হতে পারে বা কোন অন্যায় সুযোগ যেন আমরা না নেই, মিথ্যার মাধ্যমে বা মিথ্যার ভিত্তিতে কোন অন্যায় সুযোগ সুবিধা যেন আমরা না নেই। অতএব তাক্বওয়ার মাপকাঠিতে সবার আত্মসমালোচনা বা আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত বা নিজের অবস্থান খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তি কীভাবে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ব্যবহার করা যায় আর ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করলেই মানুষের উন্নতি হয় এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শক্তি-বৃত্তি দিয়েছেন তা নষ্ট করার জন্য দেন নি, সেগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং যথাযথভাবে**

ব্যবহার করার মাঝেই এর উন্নতি নিহিত। এগুলোর বৃদ্ধি, এগুলোকে কাজে লাগানো এবং ভাল রাখতে হলে এর বৈধ ব্যবহার আবশ্যক। এ কারণেই ইসলাম পুরুষত্ব নষ্ট করা বা চোখ উৎপাটনের শিক্ষা দেয়নি বরং এগুলোর বৈধ ব্যবহারকে আত্মশুদ্ধির কারণ আখ্যায়িত করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ' **(সূরা আল্-মু'মিনূন: ০২)।**

এরপর মুত্তাকীর জীবনচিত্র অংকন করে শেষের দিকে উপসংহারস্বরূপ বলেন, 'فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ' (সূরা আল্-মু'মিনূন: ১০৩) **অর্থাৎ এমন মানুষ যারা তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করে, অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে, নামায দোদুল্যমান হলে নামাযকে পুনরায় দণ্ডায়মান করে, খোদা প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, যখন ইবাদত করে আর বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা মাথাচাড়া দেয় তখন পুনরায় খোদার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে, সেই সমস্ত চিন্তা-ধারাকে ঝেড়ে ফেলে।** অনেক সময় নামাযের প্রতি মনোযোগ থাকে না যে, যথা সময়ে নামায পড়তে হবে, কিন্তু এরা আবার নিজেদের সংশোধন করে, সময় মত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, **এমন মানুষই সফলকাম হয় এবং খোদা প্রদত্ত রিয্ক থেকে তারা খরচ করে। রিপুর তাড়না সত্ত্বেও বিনা বাক্য ব্যয়ে অতীত ও বর্তমান গ্রন্থে ঈমান আনে। অবশেষে সেই বিশ্বাসের পর্যায়ে তারা পৌঁছে যায়।** অদৃশ্যে ঈমান থাকলে তারা বিশ্বাসে উপনীত হয়, এমন ঈমান সৃষ্টি হয় যা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়। এমন মানুষই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা এমন এক পথে প্রতিষ্ঠিত যা ক্রমশঃ অগ্রসরমান, যার মাধ্যমে মানুষ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, এরাই সফল, যারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে আর পথের বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাবে। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রারম্ভেই তাক্বওয়ার শিক্ষা দিয়ে এমন এক গ্রন্থ আমাদের দান করেছেন যাতে তাক্বওয়া সংক্রান্ত ওসীয়্যত এবং নসীহতও করেছেন। সুতরাং আমাদের জামাতের সদস্যদের হৃদয়ে সমস্ত জাগতিক চিন্তার চেয়ে এই চিন্তা অগ্রগণ্য হওয়া উচিত যে, তাদের মাঝে তাক্বওয়া আছে কি না?

এরপর খোদা ভীতি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **খোদাভীতি যাতে নিহিত তাহলো মানুষের এটি দেখা যে, তার কথা এবং কর্মে কতটা সামাঞ্জস্য রয়েছে?** কথা কি বলছে আর কাজ কি করছে, কোন সামাঞ্জস্য আছে কি-না **অর্থাৎ একটির সাথে অন্যটির সামাঞ্জস্য আছে কি না। যদি দেখে, তার কথা এবং কর্মের সামাঞ্জস্য নেই তাহলে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, সে খোদার ক্রোধভাজন হবে। যে হৃদয় অপবিত্র তার কথা যতই পবিত্র হোক না কেন সে হৃদয় আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না।** হৃদয় যদি নোংরা হয়, কর্ম যদি কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে যত নেক কথাই আমরা বলি না কেন খোদার দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই বরং খোদার ক্রোধকেই সে আমন্ত্রণ জানাবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন। **অতএব আমার জামাতের জানা উচিত যে, তারা আমার কাছে বীজ গ্রহণের জন্য বা বীজতলা হিসেবে এসেছে যার ফলে তারা এক ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হবে।** তাই সবার নিজের জীবন সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, তার ভেতর কেমন আর বাইর কেমন। **যদি আমাদের জামাতও আল্লাহ্ না করুন এমন হয়ে থাকে যাদের মুখে কিছু আর হৃদয়ে ভিন্ন কিছু তাহলে এর পরিণাম শুভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন, এক জামাতের হৃদয় খালি আর মুখে বড় বড় দ বুলি তাদের জানা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা পরবিমুখ বা অমুখাপেক্ষী। বদরে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সকল অর্থে বিজয়ের আশা ছিল, আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, বিজয় দান করব, কিন্তু তাসত্ত্বেও মহানবী (সা.) কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। হযরত আবু বকর**

সিদ্দিক (রা.) বলেন, সকল অর্থে যেখানে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেখানে এত বিগলিত চিত্তে ক্রন্দনের প্রয়োজন কী? মহানবী (সা.) বলেন, খোদা তা'লা গণী বা অমুখাপেক্ষী, হয়ত খোদার প্রতিশ্রুতিতে কোন গোপন শর্ত থাকবে। তাই আমাদের জন্য বড় ভয়ের বিষয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উন্নতি এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই জয়যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য আমাদের আত্মাজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **আমাদের জামাতের জন্য বিশেষভাবে তাক্বওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে বা তাঁর জামাতভুক্ত যিনি প্রত্যাদৃষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন, যেন এমন মানুষ যারা কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বা শির্‌কে লিপ্ত ছিল বা যেমন জগতমুখিতাই হোক কেন তা থেকে মুক্তি পেতে পারে।** বিভিন্ন পুরনো ব্যাধি ছিল কিন্তু এখন এমন এক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হচ্ছে যিনি প্রত্যাদৃষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন। আপনারা তাঁর সাথে সম্পর্কের দাবি করেছেন যেন এই সমস্ত বিষয় এবং সমস্যাবলি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। তিনি (আ.) বলেন, **আপনারা জানেন যে, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার অসুস্থতা বড় হোক বা ছোট এর জন্য যদি চিকিৎসা না করা হয় আর চিকিৎসার কষ্ট সহ্য না করা হয় তাহলে রোগ নিরাময় হতে পারে না। মুখে একটা কালো দাগ বের হলে মহা দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়, কোথাও এ দাগ সম্প্রসারিত হয়ে সারা মুখে না ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে গুনাহ্ বা পাপেরও একটি দাগ রয়েছে যা হৃদয়ের ওপর পড়ে। ছোট পাপই ঔদাসীন্য, ভ্রুক্ষেপহীনতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে গুনাহে কবীরায় পর্যবসিত হয়।** মানুষ মনে করে সামান্য বিষয়, ভ্রুক্ষেপ করে না, আলস্য প্রদর্শন করে, এর সুরাহার ক্ষেত্রে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে না, তা থেকে বিরত থাকার জন্য খোদার তাক্বওয়া অবলম্বন করে না, এই আলস্যই অবশেষে বড় পাপে পর্যবসিত হয়। **ছোট গুনাহ্ সেই ছোট দাগই যা সম্প্রসারিত হয়ে অবশেষে পুরো মুখকে কালো করে ফেলে।** ছোট পাপই বড় পাপে পর্যবসিত হয় এবং আপাদমস্তক মানুষ কালিমালিপ্ত হয়ে যায়।

রমযানের এই বিশেষ পরিবেশে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাক্বওয়া অবলম্বনের তৌফিক দিন। আর আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সেই সদস্য হতে পারি যারা সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজেদের প্রতিটি কাজকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধিনস্ত করবে। আর এই মাস থেকে আমরা যেন এমনভাবে পবিত্র হয়ে বের হই আর পুণ্যের ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হই যেন আমাদের ছুটে যাওয়া পাপ এবং দুর্বলতা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াব। একটি হাযের জানাযা যা যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি নিবাসী শ্রদ্ধেয়া তাহেরা হামীদ সাহেবার। স্বামীর নাম আব্দুল হামীদ মরহুম । গত ৮ জুন দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৬০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার ছিল সম্পর্ক পাকিস্তানের জেহলামের সাথে, ২০০১ সনে যুক্তরাজ্যে আসেন। পুণ্যবতী, নামাযে অভ্যস্ত ও খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন, বাচ্চাদের সঠিক তরবীয়ত করেছেন, সন্তান-সন্ততিকে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন, বিশেষ করে নামাযের প্রতি যত্নশীলা। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে মা ছাড়াও এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রূহের মাগফিরাত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দান করুন।

দ্বিতীয়টি হল, গায়েবানা জানাযা যা আটকের জনাব হামীদ আহমদ শহীদের, পিতার নাম শরীফ আহমদ। তার বয়স ছিল ৬৩, আটকেই বসবাস করতেন। জামাতের বিরোধীরা গত ৪ জুন দুপুর আড়াইটার সময় তার ঘরের বাহিরে গুলি করে তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে ৪ জুন জনাব হামীদ সাহেব নামাযে যোহর পড়ে মসজিদ থেকে ঘরে ফিরে আসেন, ঘরের গেইটে এসে মটর সাইকেলের হর্ণ বাজান, তার কন্যা বাহিরের গেইট খোলার জন্য আসছিলেন, তখনই অজ্ঞাত পরিচয় আক্রমণকারীরা আসে এবং হামীদ সাহেবকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। হামীদ সাহেবের মুখের ডান দিকে একটি বুলেট লাগে এবং বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলি বিদ্ধ হওয়ার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদা জনাব মিঞাঁ মোহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে, যিনি গুজরানওয়ালা নিবাসী ছিলেন। ১৯২৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পবিত্র হাতে তিনি বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুম ১৯৫৩ সনের ১৫ মে, গুজরানওয়ালার লাভেরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর আটকে সানজুয়াল ফ্যাক্টরীতে তিনি চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরীর পাশপাশি তিনি গ্র্যাজুয়েশন করেন আর একইসাথে ডিএইচএমএস-এর কোর্সও সম্পন্ন করেন, হোমিও প্র্যাক্টিসও করতেন। ২৬ বছর চাকরী করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর আটক শহরে হোমিও ক্লিনিক খুলেন। ১৯৮২ সনে শ্রদ্ধেয়া আমাতুল করীম সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। রাবওয়া নিবাসী তার শ্বশুরের নাম হল, বশীর আহমদ সাহেব। রাবওয়া ক্লথ ষ্টোর হিসেবে তার দোকান প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর স্ত্রী ৪ বছর পূর্বে ইন্তকাল করেন, অসুস্থ ছিলেন। আটকের সরকারী কলেজের লেকচারার হিসেবে তিনি চাকরী করতেন। শহীদ মরহুম বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তবলীগ, আতিথেয়তা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, দরিদ্রদের সাহায্য করা, ওহদাদারদের বা জামাতের কর্মকর্তাদের আনুগত্য তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। খুবই কর্মঠ ও সক্রিয় দাঈইলাল্লাহ্ ছিলেন। আবশ্যকীয় চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। সানজুয়াল ফ্যাক্টরীতে চাকরীকালে তার এক সহকর্মীকে বয়আত করান এরপর সেই ব্যক্তির পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আরেক পরিবারের ৯ জন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন (তার মাধ্যমে)। এই কারণে ফ্যাক্টরীতে তার বিরোধিতা আরম্ভ হয়। শহীদ মরহুম সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটে থাকতেন। বিরোধীরা তার ঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। অবশেষে ফ্যাক্টরীর ব্যবস্থাপকরা হামীদ সাহেব এবং তার নতুন বয়আতকারী সহকর্মীকে সানজুয়াল থেকে রাওয়ালপিন্ডির ওয়াহ্ ফ্যাক্টরীতে বদলী করেন। শহীদ মরহুম বেশ কিছু দিন থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। ২০১৫ সনের জানুয়ারি মাসে এক দুস্কৃতকারী আটকের মসজিদ এবং তার ক্লিনিকে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে। যাহোক, যথা সময়ে পাহারাদার আসার কারণে সেই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। এ ঘটনার দু'দিন পর সেই দুস্কৃতকারী তার ক্লিনিকে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে এবং ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে, তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। তার পুত্র নাভিদ আহমদ সাহেব এখানেই আছেন, তিনি পিতার জানাযায় যেতে পারেন নি। তিনি বলেন, আমার পিতা খিলাফতের আনুগত্যশীল একজন মানুষ ছিলেন, খুবই সাহসী ছিলেন, তবলীগ করতেন, পাঁচ বেলার নামায নিজেও পড়তেন আর আমাদেরও নসীহত করতেন, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন

এবং তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন। এখানেও তিনি বেশ কয়েকবার জলসায় এসেছেন। সব সময় মসজিদ ফযলে এসে বাজামাত নামায পড়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। তার ছোট কন্যা সালমা নুজহাত বলেন, আমাদের পিতা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন, সব তাহরীকে আগ্রহভরে সাড়া দিতেন। শাহাদাতের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি বলেছিলেন, হে আমার কন্যা! জীবনের কোন ভরসা নেই, আর সব সময় পুণ্যের বা সৎকর্মেরও নসীহত করতেন। তার এক কন্যার নাম হল, ফাসাহাত হামীদ সাহেবা, তিনি বলেন, লন্ডন থেকে অডিও খুতবা যা আসত তা রেকর্ড করে তিনি বন্ধুদেরকে whatsapp-এ পাঠাতেন।

তার দ্বিতীয় পুত্রের নাম হল, সাঈদ আহমদ সাহেব, তারও একই ভাষ্য। একই গুণাবলীর কথা সবাই লিখেছেন যে, অত্যন্ত নেক, পুণ্যের নসীহতকারী, সৎসাহসী, তবলীগকারী ছিলেন। পাকিস্তানের পরিবেশে তবলীগ করা খুব কঠিন কাজ। মরহুম আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে কর্মরত যহুর সাহেবের ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনিও লিখেছেন, জামাতি দায়িত্ব বড় কষ্ট সহ্য করে সততার সাথে পালন করতেন। যত বেশি সম্ভব হত সময় বের করে খিদমতের বা জামাতের কাজ করার চেষ্টা করতেন, সব তাহরীকে অংশ নিতেন, সন্তান-সন্ততিকে জামাতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করতেন, তাহাজ্জুদ গুযার এবং নেক ছিলেন, দীর্ঘ দোয়ায় রত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির হাফেয এবং নাসের হোন, সেখানে তার সন্তানদেরও প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং পিতার পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।